হাতটা একবার দেহাও না ক্যান?

– হাত? হাত দেখাব কেন? মুখে হাসি এনে বলে রিতা।

হকচকিয়ে যায় বিজয়া।

– না, কইছিলাম কি, আমতা আমতা করে বলে, তাবিজ কবজে অনেক কাজ কম হয় গো বউদি।

– বিজয়া তার মঙ্গল কামনা করে সর্বদা এটা বোঝে রিতা।

– ঠাট্টা না গো বউদি, সত্যি কইতাছি।

বাঁ হাতের ব্লাউজ খানিকটা উঠিয়ে রিতাকে তাবিজ দেখিয়ে বলে,

– এই দ্যাহো, এই তাবিজটা পরনের পর তুমাদের আশীর্বাদে সংসারে দু'মুঠো খাইয়া ভালই আছি গো।

বিজয়ার হাত নাড়িয়ে বলার ভঙ্গি দেখে হাসি চাপতে মুখে হাত রেখে ঈষৎ ঘাড় নাড়ে। কেন এ কথা বলল বিজয়া বেশ বোঝে রিতা।

– সে তুমি বিশ্বাস করো আর নাই করো। আমি যা কইছি তুমার ভালার লাইগ্যাই কইছি। অহন তুমার ব্যাপার।

বিজয়া চলে যেতেই রিতা রান্না ঘরে ঢোকে। বিজয়ার কথাগুলো ভাবতে ভাবতে হঠাৎ করে তার মনে পড়ে যায় তার কিশোরী বেলার কথা। তাদের পাশের বাড়ির ইন্দ্রনীলদা। আর পাঁচটা মেয়ের চাইতে তাকে একটু যে অন্য চোখে দেখত, সে বুঝতে পারত। একদিন তো ফাঁকা পেয়ে বলেওছিল নীচু গলায় যে সে তাকে খুব পছন্দ করে।

রিতা কোন উত্তর না দিয়ে দৌড়ে বাড়ি চলে এসেছিল। ছোট থেকে স্বভাব লাজুক রিতা। বাবাকে ভীষণ ভয় করত। স্কুলবেলায় কোনও সম্পর্কের কথা জানলে দক্ষযজ্ঞ লাগবে বাড়িতে। ভয়ে ইন্দ্রনীলদের বাড়িই যেত না সে আর। তবে রাস্তাঘাটে দেখা হলে ইন্দ্রনীল কথা বলার চেষ্টা করতেই ও পাশ কাটাত।

এইচ.এস.এর পর ডাক্তারিতে চান্স পেয়ে ইন্দ্রনীল বাইরে পড়তে চলে যাওয়ার পর আর দেখা হয়নি। হয়তো এখন কোথাও কোনও হাসপাতালের ডাক্তার। বিয়ে থা করে বউ বাচ্চা নিয়ে সংসারও করছে। ভাবনার ডানা প্রসারিত হয়ে পড়ে অবচেতন মনে।

এ সব ভাবতে ভারতে নিজের বাঁ হাতের তালু মেলে ধরে রিতা। হাতের রেখাগুলোয় দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। একা একাই হেসে ওঠে। হস্তরেখাবিদ বলবেন – আপনার ছোটবেলায় এই হয়েছিল, ওই হয়েছিল। অবশেষে বলবেন, আপনার এই রেখাটা যখন ওই রেখা টাচ করবে, তখন আপনার ...।

আচ্ছা ওই হস্তরেখাবিদ যদি ঋতব্রতই হত ...

ভাবতে ভাবতে মুচকি হাসে রিতা। ধ্যাৎ, কিসব আজগুবি ভাবনা জড়িয়ে ধরছে তাকে। কিন্তু মনের গভীরে ভালো লাগার একটা আবেশ খেলা করে।

অন্যান্য দিনের মতো দুপুরে শুয়ে শুয়ে টিভি সিরিয়াল দেখছিল রিতা। তার মনে পড়ে বিজয়ার কথা। অভাব অনটনের মধ্যেও বেশ আছে স্বামী–মেয়েকে নিয়ে।

একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে রিতার। প্রাচুর্যের মধ্যে থেকেও তার যেন কিছুই নেই। এমনটাই মনে হয় তার। ঋতব্রতর চাকরির ব্যস্ততা, তার হৃদয় জুড়ে সে, তাদের সংসারে নতুন অতিথি, একটা ফুটফুটে মেয়ে আলো করে আছে তাদের স্বপ্নের পৃথিবী। এ সব ভাবতে ভাবতে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল রোজকার মতো সেদিনও।

আচম্বিতে রিতা অনুভব করে তার বাহুদ্বয়ে কারও ছোঁয়া। স্পর্শানুভূতিতে শিরশির করে ওঠে তার শরীর, সচকিত হয়ে ওঠে প্রতিটি রোমকূপ। চোখ খুলে বিস্মিত রিতা। এ তো ঋতব্রত! আবেগে দু'চোখ বন্ধ হয়ে আসে রিতার।

কিন্তু এই অনাবিল আনন্দে ভেসে যাওয়া, রোমাঞ্চকর মুহূর্ত বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে তার। কোনওক্রমে বলে সে, প্লিজ ঋতব্রত ..., চোখ খুলে কিছু বলতে গিয়ে আঁতকে ওঠে রিতা। এ কী বিস্ময় তার জন্য অপেক্ষা করছিল। কোথায় ঋতব্রত! এতো ইন্দ্রনীল!

শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে চাইছে সে। চিৎকার করছে, কিন্তু কি আশ্চর্য! তার গলা দিয়ে কোন আওয়াজ বেরোচ্ছে না। ছটফট করছে সে। তার শরীর ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে আসছে। মনে হচ্ছে তার প্রাণবায়ু বেড়িয়ে যাওয়ার অপেক্ষায়।

একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে রিতার। প্রাচুর্যের মধ্যে থেকেও তার যেন কিছুই নেই। এমনটাই মনে হয় তার। ঋতব্রতর চাকরির ব্যস্ততা, তার হৃদয় জুড়ে সে, তাদের সংসারে নতুন অতিথি, একটা ফুটফুটে মেয়ে আলো করে আছে তাদের স্বপ্নের পৃথিবী। এ সব ভাবতে ভাবতে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল রোজকার মতো সেদিনও

ঠিক এই সময়ে মাথার কাছে রাখা তার মোবাইল বেজে ওঠে। ধড়ফড় করে বিছানায় উঠে বসে রিতা। গলা শুকিয়ে কাঠ। বুকের ভিতর যেন হাপর চলছে।

ঋতব্রতর ফোন। ঢোঁক গিলে বলে,

– হ্যাঁ বলো,

– একটা সারপ্রাইজ আছে –

– সারপ্রাইজ! বিস্মিত কণ্ঠ রিতার।

– হ্যাঁ ম্যাডাম, প্রোমোশন অর্ডার আমার হাতে, এজিএম।

– তাই! এ তো দারুণ খবর! কনগ্রাচুলেশন এজিএম সাহেব। মনের প্রফুল্লতা মুহূর্তে সব বিষণ্ণতা ভুলিয়ে দেয় রিতার।

– শোনো, তুমি রেডি হয়ে থাকবে। একটু পরেই আমি বেরোচ্ছি। সিটি সেন্টার যাব। সিনেমার টিকিট কেটে রেখেছি।

ডিনার করেই ফিরব। একটানা কথাগুলো বলে যায় ঋতব্রত। কথায় স্নিগ্ধতার পরশ অনুভব করে রিতা।

রিতার মন আনন্দে ভরে ওঠে। কতদিন পর এমন উৎফুল্ল ঋতব্রত!

– আচ্ছা, আচ্ছা, আমি রেডি হয়েই থাকব।

– বড় সাহেব আছেন, আমি ছাড়লাম তা হলে।

– ঠিক আছে। রিতা মোবাইল রেখে দেয়। সবই যেন তার কাছে অলৌকিক মনে হচ্ছে এই মুহূর্তে। মনে মনে ভাবে ঋতব্রত'র এই হাড়ভাঙা খাটুনির একটা পুরস্কার তো পেয়েছে।

স্বভাবতই খুব খুশি রিতা। বেশি খুশি ঋতব্রত'র উচ্ছ্বসিত আন্তরিক কথাবার্তায়। সেই প্রাণচঞ্চল ঋতব্রত। এমন আকস্মিক খুশির ছোঁয়ায় দুলতে থাকে রিতার হৃদয়। মনের গভীরে যেন বইছে শরতের হালকা হিমেল হাওয়া। হৃদয়ে কাশফুল।

অঙ্কন ঃ অভি

অণুগল্প

দামি শাড়ি

সোমেন রায়

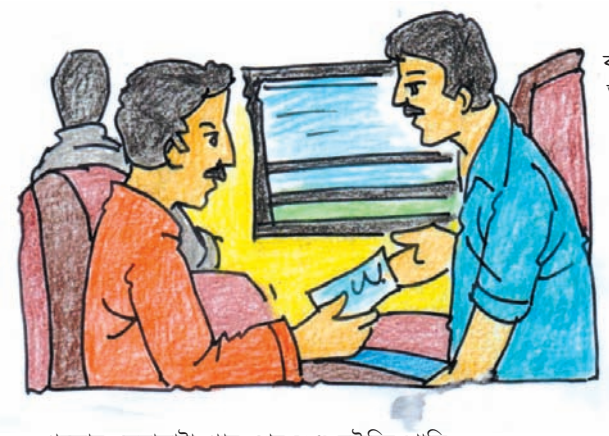

পুজোর কেনাকাটা প্রায় শেষ শুধু বউদির শাড়ি কেনা বাকি। তাই সুবোধদা বউদিকে নিয়ে শঙ্করদার দোকানে উপস্থিত। সঙ্গে দশ বছরের ছেলে। বিয়ে হয়েছে আজ তেরো বছর, কিন্তু শঙ্করদার দোকান ছাড়া অন্য কোথাও থেকে কখনও বউদির শাড়ি কেনেননি সুবোধদা। যাকে বলে একেবারে একনিষ্ঠ।

দোকানে ঢুকেই সুবোধদা বললেন, 'শঙ্কর এসে পড়েছি, তোর দোকানের সবচাইতে দামি শাড়িগুলি বের করে বউদিকে দেখা! তুই তো জানিস তোর বউদির ঠিক কীরকম শাড়ি পছন্দ।'

শঙ্কর – 'তুমি ফেসবুক, হোয়াটস অ্যাপ চালাও দেখি, এদিকের কথা তোমার ভুলে গেলেও চলবে।'

শঙ্করদা শুরু করলেন, 'এই যে বউদি এইটে ৪ হাজার, এটা ৬ হাজার আর এটা ৭ হাজার।'

বউদি – ভালো কিন্তু কেমন যেন লাগছে, কাপড় ভালো তো?

শঙ্কর – ঠিকই বলেছেন বউদি দাঁড়ান, এই যে এটা পিওর সিল্ক পুরো ৯ হাজার টাকা।

বউদি – ভালোই কিন্তু রংটা একটু কেমন লাগছে না?

শঙ্কর – ঠিকই বলেছেন বউদি, আপনাকে এখন যে শাড়িটা দেখাব, বুঝবেন একবার দেখলেই বুঝবেন। এই যে এই শাড়ি পুরো ১২ হাজার টাকা। এমন কালেকশন এই এলাকার কারও কাছে নেই। দেখেছেন কী রং!

বউদি – বাঃ, কিন্তু একটু বেশি দাম হয়ে গেল না?

সুবোধদা ফোনটা ছেলের হাতে রেখে কিছুটা উত্তেজিত হয়েই বললেন, 'এটা কী বলছ, তোমাকে কোনওদিন দাম নিয়ে ভাবতে বলেছি। তোমার পছন্দ হয়েছে তো? শঙ্কর এমন একই কোয়ালিটির দু'টো শাড়ি দিবি বুঝলি।'

এমনি সময় সুবোধদার ছেলে বলে উঠল, 'বাবা শঙ্করকাকু হোয়াটস অ্যাপ মেসেজে লিখেছে, '২ হাজার টাকার কম দিতে পারব না'।

পিকনিক

বিনয় ভূষণ বেরা

– দাদু, ও দাদু – পিকনিক করতে যাবে?

চমকে উঠি। এই জষ্টির প্যাচপ্যাচে গরমে পিকনিক! চোখ তুলে তাকাই পাঁচ বছরের নাতির দিকে।

ওর জন্ম মুম্বইতে। আমার ছেলে ওখানেই সেটেল্‌ড। প্রতি বছর ডিসেম্বর নাগাদ আসে সপরিবারে। তখন সবাই মিলে পিকনিকে যাওয়া হয়, ডুয়ার্স কিংবা কোনও পাহাড়ি নদীর ধারে। খুব মজা হয়। এবারেই শিলিগুড়িতে অফিসের বিশেষ কাজে ছুটে আসতে হয়েছে ওকে এই মে মাসেই। নাতি জানে, দাদুর বাড়িতে এলেই পিকনিক হয়। ছেলেমানুষ, শীত গ্রীষ্ম বোঝে না অত।

– না দাদুভাই, এখন পিকনিকের সময় নয়। দেখছ না, কী গরম! এ সি ছাড়া থাকাই যাচ্ছে না – কৈফিয়ত দাখিল করি আমি।

– কত লোক তো পিকনিক করছে, ওদের গরম লাগে না? পাল্টা তর্ক জোড়ে পাঁচ বছরের নাতি।

এখন পিকনিক? কোথায়? – অবিশ্বাসের চোখে তাকাই।

– ওই তো, ওরা কেমন পিকনিক করছে। কালও করছিল, দ্যাখোনি?

আমার বাড়ির সামনেই উঠছে একটা বহুতল, তারই লেবাররা। বাঁশের খুঁটোয় টাঙানো কালো পলিথিনের নীচে আস্তানা আর পড়ন্ত বেলায় খোলা আকাশের নীচে ইটের উনুনে রান্নাশেষে ঘাসের গালিচায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে খাওয়া। সস্তার মোবাইলে জোর হিন্দি ফিলমি গান। সেইসঙ্গে দু'চারটে রসালো কথা – অশ্লীল খিস্তিখেউড়। কিছু আদিরসাত্মক মন্তব্যও কানে এসেছে দু'একদিন। 'ভদ্র'লোকের কানের ভিতর দিয়ে আর মরমে পশেনি। কিন্তু ওদের এন্টারটেনমেন্ট বলতে তো এটাই। সারাদিনের হাড়ভাঙা খাটুনির পর বিকেলে জিরেন, তারপর পিকনিক।

অঙ্কন ঃ শংকর বসাক